South Calcutta Girls' College

Anubhab (অনুভব)

বাংলা বিভাগ

Department of Bengali

2022-23

ANUBHAB, MAGAZINE (e-Version), 2022-23
DEPARTMENT OF BENGALI
SOUTH CALCUTTA GIRLS' COLLEGE
72 SARAT BOSE ROAD, KOLKATA 700025

অনুভব, ই-সংস্করণ, ২০২২-২৩
বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা
সাউথ ক্যালকাটা গার্লস্ কলেজ
৭২ শরৎ বোস রোড, কোলকাতা ৭০০০২৫

Published On: 21.02.2023
প্রকাশ: ২১-০২-২০২৩

Editor: Pataur Jaman
সম্পাদক: পাতাউর জামান

Typesetting: Mahua Das, Moitry Halder
বর্ণসজ্জা: মহুয়া দাস, মৈত্রী হালদার

Cover Design: Pataur Jaman
প্রচ্ছদ: পাতাউর জামান

সূচিপত্র

অধ্যক্ষার কলমে - ২

বিভাগের পক্ষ থেকে - ৩

গল্প

প্রতিশোধ – অর্পিতা কর্মকার - ৫

আলাপ – মহুয়া দাস - ৮

অভিমান – মৈত্রী হালদার - ১০

পরিণতি – দেবলীনা দাস - ১২

হারাধনের সংসার – রিয়া কুণ্ডু - ১৩

হ্যালোইনের রাত – সঙ্গীতা সর্দার - ১৫

কবিতা

জীবন – মঞ্জুরী সাউ - ১৮

ফাস্টফুড – সুইটি নস্কর - ১৯

কালের প্রবাহ – সুপর্ণা দাস - ২০

গদ্য

পাহাড়যাত্রা- শ্রেতা পাঞ্জা - ২২

জীবন – সে কি কেবলি যাতনাময় – অন্বেষা নন্দী - ২৩

অরণ্যের অধিকারের অমূল্য – আত্রেয়ী চৌধুরী - ২৫

বাঙালির শিক্ষা ও সংস্কৃতি – কুহেলী মাঝি - ২৭

অ্যাটম বোম- সায়ন্তনী মল্লিক - ২৯

কলেজ ম্যাগাজিন – সাগিয়া পারভিন - ৩১

স্বপ্নপূরণ এবং স্বপ্নহরণ – সুস্মিতা বোস - ৩৩

চিত্রকলা

সাগিয়া পারভিন - ৩৫

অন্নপূর্ণা হোড় - ৩৬

সুদীপ্তা দাস – ৩৭

শ্রেতা পাঞ্জা - ৩৮

ফটোগ্রাফি

সৌমিতা রায় – ৪০

অধ্যক্ষার কলমে

একজন মানুষের সার্বিক বিকাশকেই আমরা শিক্ষা বলে মানি। তাই কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তকের গণ্ডী আর সিলেবাসের সীমারেখায় এইসব তরুণ মনগুলোকে বেঁধে না রেখে, ভাবনার বিস্তারে, সৃষ্টির আনন্দে আমরা তাদের মুক্তি দিতে চাই। সৃজনশীলতার মধ্যে দিয়ে একজন মানুষকে সব থেকে বেশি করে চেনা যায়। আমার ছাত্রীরা যেমন প্রতিনিয়ত তাদের জীবনকে চিনছে, তেমনই আমরাও চিনতে চাই ওদের ভাবনার জগতকে, অনুভবের প্রকাশকে। সেইজন্যই আমাদের বাংলা বিভাগের এই ম্যাগাজিনের প্রয়াস।

আমি অভিনন্দন জানাই সেই সব অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের, যাঁদের নিরলস প্রচেষ্টায় এই ম্যাগাজিন সার্থকভাবে প্রকাশ পেল। আমার স্নেহাশিস রইলো সেইসব ছাত্রীদের প্রতি, যারা এই দুই মলাটকে সাজিয়ে তুললো তাদের নিজেদের ভাবনা দিয়ে। আমাদের কলেজের ছাত্র-শিক্ষকের সুমধুর বন্ধনের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকে এভাবেই বহমান রেখেছে বাংলা বিভাগের এই প্রয়াস। আগামীর দিনগুলিতেও আমাদের কলেজ এমনই সব সম্ভাবনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকবে। আমার আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকবে এই ধারাকে ভবিষ্যতের অভিমুখে সার্থকভাবে এগিয়ে নিয়ে চলার দিকে।

প্রফেসর (ড.) অপর্ণা দে,
অধ্যক্ষা
সাউথ ক্যালকাটা গার্লস্ কলেজ

বিভাগের পক্ষ থেকে

প্রকাশিত হল সাউথ ক্যালকাটা গার্লস কলেজের বাংলা বিভাগের মুখপত্র - 'অনুভব'। অতিমারীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রায় দু'বছর সারা বিশ্ব লড়াই করেছে এক ভয়াবহ দুঃসময়ের সঙ্গে। অসহায়তা, অনিশ্চয়তা আর অবরুদ্ধ প্রাত্যহিক যাপনের সেই দুঃস্বপ্ন পেরিয়ে আজ আবার আমরা প্রতিদিনই ফিরে আসছি কাঙ্খিত স্বাভাবিকতায়। 'অনুভব'-এর প্রকাশ সেই সুপ্রার্থিত সুসময়কে আরো কাছে এনে দিল। আরো কাছাকাছি হলাম বাংলা বিভাগ পরিবারের সব সদস্য।

ই-পত্রিকার পরামর্শ দিয়ে বিভাগকে নতুন ভাবনায় ভাবার সাহস এবং উৎসাহ দিয়েছেন কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষা ড. অপর্ণা দে। তাঁকে বিভাগের তরফ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই, জানাই ধন্যবাদ।

পত্রিকার মূল দায়িত্ব ছিল বিভাগের অধ্যাপক পাতাউর জামানের ওপর। নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি সেই দায়িত্ব পালন করেছেন। তবে ধন্যবাদ দেওয়ার সম্পর্ক তাঁর সাথে নেই। ষষ্ঠ সেমিস্টারের ছাত্রী মৈত্রী এবং মহুয়ার সহযোগিতার কথা এই প্রসঙ্গে গর্বের সঙ্গেই উল্লেখ করছি। ছাত্রীভাগ্যে বাংলা বিভাগ বরাবরই সমৃদ্ধ। বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপিকাও এই পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে অদম্য উৎসাহ এবং অকুণ্ঠ সহায়তার হাত বাড়িয়ে ঋণী করেছেন আমাকে। যে যে ছাত্রী লিখেছে, তাঁরা তো রইলই পত্রিকার অঙ্গ হয়ে, কিন্তু বাকিরাও যে শ্রমে এবং মননে এই পত্রিকার সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছে — তা বিভাগীয় প্রধান হিসেবে নিশ্চিত হয়েই বলতে পারি।

মৌরী মজুমদার
বিভাগীয় প্রধান
বাংলা বিভাগ
সাউথ ক্যালকাটা গার্লস্ কলেজ

গল্প

প্রতিশোধ

অর্পিতা কর্মকার
ষষ্ঠ সেমিস্টার

ছেলেটির নাম আকাশ চ্যাটার্জি বিজ্ঞাপন সংস্থার উচ্চপদে সে কাজ করে। ছোটো বড়ো সবাইকে সাহায্য করে নানারকম লেখার ব্যাপারে। সবাই তাকে খুবই ভালোবাসে, অফিস থেকে পাড়ার সকলে। ঘরের সদস্য বেশি কেউ নেই - মা, বাবা আর আকাশ। তার বাবা-মা প্রবল চিন্তায় থাকে ছেলেকে নিয়ে। ছেলের বয়স হয়েছে প্রায় ৩১ বছর। বাবা মায়ের ইচ্ছে তাকে বিয়ে দেওয়ার। কিন্তু ছেলের সেদিকে মন কোথায়! বিয়ের কথা উঠলে আকাশ বলে, মা দাঁড়াও না, আর দু'বছর যাক তারপর। মূলত ব্যাপার ঠিক দু'বছর না। তার মাথায় ঘোরে, বিয়ে করলে কত দায়িত্ব, কত কর্তব্য আরো কত সব নিয়ম! তার মতে বিয়ের আগে জীবন কত সহজ সরল, কোন নিয়ম বাধা কিছু না। আর বিয়ের পর সব নিয়ম বাধার বেড়াজালগুলো তার ব্যক্তি-স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করবে। আর সেটা সে করতে নারাজ। তাই ভয়ে সে আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে যায় না পাছে বিয়ের কথা ওঠে। ছেলেটি বিভিন্ন লেখালেখির মধ্যে ভূতের গল্প লিখতে বড়ো ভালোবাসতো। সে মনে করত ভূতের গল্প লেখার জন্য নিঝুম জায়গার প্রয়োজন। তাই সে একদিন হঠাৎ অফিসে ছুটির দরখাস্ত জমা দিয়ে চলে যায় কোচবিহারে তার পুরনো বন্ধু রাহুলের বাড়িতে। সে তার গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। রাহুল হতবাক হয়ে পড়ে আকাশকে দেখে। নানা রকম প্রশ্ন করতে থাকে। কি খবর তোর? কেমন আছিস? আকাশ বলে, দাঁড়া দাঁড়া আমায় একটু বসতে দে। আমার কথাটা শেষ করতে দে। এখানে এসেছি একটি কাজে। একটি নিঝুম ফাঁকা বাড়ি, গা ছমছমে জায়গা যেখানে বসে ভূত-প্রেতের গল্প লেখা যাবে। ছোটবেলা থেকে আকাশ বেশ সাহসী ছেলে। সে বিশ্বাস করে না ভূত বলে এই পৃথিবীতে কোনো কিছু আছে। সে মনে করে এটা আসলে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক কুসংস্কারযুক্ত বিশ্বাস।

একদিন রাহুল আকাশকে ঠিক সেরকমই একটি নিঝুম গা ছমছমে বাড়িতে নিয়ে যায় এবং বলে এখানে তুই লেখালেখি করতে পারিস, কিন্তু আমি বাড়িতে চলে যাচ্ছি। এখানে থাকতে পারবো না। রাহুল আগাগোড়াই ভীতু স্বভাবের ছেলে। আকাশ রাতে খাবারের পর্ব শেষ করে বসল লেখালেখির কাজে। হঠাৎ শুনতে পায় কোন কাঠের জিনিসের ওপর কেউ হাতুড়ি দিয়ে পেটাচ্ছে। লেখা থামিয়ে আকাশ উঠে পড়ে এবং বোঝার চেষ্টা করছিল শব্দটি কোথা থেকে আসছে। কিছুক্ষণ পরে আকাশ বুঝতে পারে আওয়াজটি আসছে উপরের ঘর থেকে। উপরে যাওয়ার পরে আওয়াজটি বন্ধ হয়ে গেল। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে আবার ওই একই আওয়াজ হতে শুরু করল। এভাবে কাটল আকাশের প্রথম রাত। দ্বিতীয় রাতে একই ঘটনা পুনরায় ঘটতে লাগল। কখনো তার এরকম মনে হয়েছে যে কেউ তাকে বালিশ চাপা দিয়ে মারার চেষ্টা করছে। বিরক্ত হয়ে সে একদিন রাহুলকে সব কথা খুলে বলল। সমস্ত কথা বলার পর আকাশ রাহুলকে

জানায় যে তার হয়তো কোন মানসিক সমস্যা হচ্ছে, তাই সে কলকাতায় ডাক্তার দেখাতে যেতে চায়। রাহুল তার ঠোঁটের কোণে এক শয়তানি হাসি হেসে বলল, তুই না সাহসী! এরকম ভয় পেলে চলে? আজ রাতে তোর সমস্ত রোগ থেকে তুই মুক্তি পাবি সারা জীবনের মতো। আকাশ হতবাক হয়ে পড়ে। তারপর রাহুল তাকে অনুরোধ করে আর একটা রাত থেকে যাবার জন্য। আকাশ রাহুলের কথা ভেবে আর একটা রাত থেকে যায়। প্রতিদিনের মতন রাতে খাবারদাবার শেষ করার পর আকাশ সেই বাড়িতে আবার লেখালেখির কাজে যায় কিন্তু সেখানে লেখালেখি করে না। সে ভাবে ঘুম ঠিকঠাক না হওয়ার কারণেই হয়তো তার এরকম সমস্যা হচ্ছে, তাই না লিখে সে ঘুমিয়ে পড়ে। মধ্যরাতে আকাশ যখন অচৈতন্য অবস্থায় ঘুমিয়ে রয়েছে, তখন সে হঠাৎ বুঝতে পারে তার গলাটা কেউ টিপে ধরেছে। সে ছটফট করতে থাকে আর বলতে থাকে, কে তুমি? কে তুমি? কেন আমায় মারতে চাও? কী ক্ষতি করেছি তোমার? কোনো রকমে আকাশ নিজেকে বাঁচিয়ে লোকটাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে ঘরের দরজা খুলে বাইরে যাবার চেষ্টা করলে আবার একজন পিছন থেকে জাপটে ধরে জোরে আঘাত করে তার মাথায়। আকাশ অনেকবার মুখোশ খুলে তার মুখ দেখবার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। লাঠির আঘাতে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, তারপর প্রায় পাঁচ ছ'জন ছেলে মিলে তাকে বেধড়ক মারধর করে আধমরা অবস্থা করে আকাশের। অবশেষে যে লোকটি মুখোশ খোলে সে হলো রাহুল। রাহুল আকাশের আধমরা শরীরটার দিকে তাকিয়ে বলে, বিখ্যাত বিজ্ঞাপক মিস্টার আকাশ চ্যাটার্জি। কাল প্রত্যেকটা খবরের কাগজের হেডলাইন বেরোবে আকাশ চ্যাটার্জিকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। কিন্তু কেউ জানবে না এমন কে করেছে? আসলে এ খুন করেছে এই রহুল সেন। কিন্তু ভাই আমি তোকে মারতাম না যদি তুই কলেজে সবার সামনে আমায় একটা হাসির খোরাক করে না তুলতিস।

সেদিন ছিল আকাশের কলেজের অ্যানুয়াল ফাংশন। ফাংশন শেষ হলে বন্ধুদের মধ্যে বেট্ হয় যে কে রাত বারোটার সময় আম গাছের নীচে দাঁড়াতে পারবে? আকাশ বলে, আমি পারবো। ওদিকে রাহুল আকাশকে টেক্কা দেওয়ার জন্য বলে, আমিও পারবো। আকাশ বলে, ভাই ভেবে দেখ রাত বারোটার সময় আম গাছের নিচে দু'ঘণ্টা দাঁড়াতে হবে তোর সাথে কেউ থাকবে না। একা তুই পারবি তো? অন্য সব বন্ধুরা তাকে ভীতু বলে খেপাতে লাগলে রাহুল বলে, আমি পারবো, পারবোই। আকাশ বলে ঠিক আছে তবে আজ রাত বারোটায় দেখা হচ্ছে আম গাছের নীচে। রাহুল পৌঁছে গেলে আকাশ কিন্তু যায় না। আকাশ তার বাকি বন্ধুদের নিয়ে রাহুলকে নানাভাবে বিব্রত করে ও ভূত সেজে রাহুলকে ভয় দেখায়। রাহুল হন্তদন্ত হয়ে হোস্টেলে ছুটে আসে। এসে দেখে, আকাশ তার বন্ধুদের সাথে বসে আছে। রাহুল ঘামতে ঘামতে সবাইকে বলে, আমি ভূত দেখেছি। আম গাছের নীচে আমি সত্যি ভূত দেখেছি। আকাশ আর তার বন্ধুরা হাসাহাসি করতে করতে বলে, আরে ভিতুরাম আমরাই সবাই মিলে তোকে ভূত সেজে ইচ্ছে করে ভয় দেখিয়েছি। তারপর থেকে রাহুল যেখানেই গেছে সেখানে হাসির খোরাক হয়ে উঠেছে। কলেজের সবাই ছোটো থেকে বড়ো সবাই তাকে ভীতুরাম ভীতুরাম বলে খ্যাপাতো। সেই থেকে

রাহুল মনে মনে একটা রাগ পুষে রাখে আকাশের প্রতি। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে যে আমি আকাশের প্রতি প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়বো, আমি জীবনেও ভুলব না আমার এই অপমানের কথা। আজ পনেরো বছর পর আমি আমার প্রতিশোধ পূর্ণ করেছি। মনে আজ একটা অদ্ভুত শান্তি হচ্ছে আমার। প্রথমে ভাবলাম তোকে ভূতের ভয় দেখিয়ে মারবো। তাই লোক পাঠালাম দোতলার ঘরে। ভূতের ভয় তো তুই পাস না, তা আমি জানি। কিন্তু তাও ভাবলাম যদি ভূতের ভয় পেয়ে মরিস। তারপর ভাবলাম – না, এদের দ্বারা কিছু হবে না, তাই মাঠে আমি নামলাম। রাহুল তার দলবলকে বলে, ফেলে আয় আকাশকে ওই মাঠে। আমাদের গ্রামে কুকুর শিয়ালের অভাব নেই। ওকে ছিঁড়ে ঠিক খেয়ে ফেলবে। ওর বডির হদিশ পাওয়া যাবে না কোথাও। রাহুলের কথা মতোই তার দলবল আকাশের শরীরটাকে নিয়ে মাঠে ফেলে আসে। কিন্তু ভোর রাতের দিকে এক মৌলবি সাহেব আকাশের ক্ষত শরীরটা তুলে নিয়ে যায় তার ঘরে। তাকে সেবা শুশ্রূষা করে ঠিক করবার চেষ্টা করতে থাকে। ওদিকে খবরের কাগজের হেডলাইন দেখে আকাশের মা-বাবা ছুটে আসে কোচবিহারে রাহুলের কাছে। রাহুলকে জিজ্ঞেস করে, আমার ছেলে কোথায়? রাহুল কান্নার অভিনয় করে তার মা বাবাকে বলে, আপনাদের ছেলে আর বেঁচে নেই কাকিমা। জানিনা কী থেকে কী হয়ে গেল। ওকে কেউ খুন করে রেখে দিয়েছে। রাহুলের মা বাবা কান্নায় ভেঙে পড়ে। তার কয়েকদিন পর কলকাতায় গিয়ে তারা আকাশের শ্রাদ্ধশান্তি করে। মৌলবি সাহেবের সেবা-শুশ্রূষায় এতদিনে আকাশ সুস্থ হয়ে উঠেছে। গ্রামের সকলের এবং বিশেষত রাহুলের চোখ এড়িয়ে আকাশ ফিরে যায় কলকাতায়, তার বাবা-মার কাছে। আকাশ সমস্ত ঘটনাটা তার বাবাকে খুলে বলে। সঙ্গে সঙ্গে তার বাবা পুলিশ নিয়ে চলে যায় কোচবিহারে রাহুলের গ্রামে, রাহুলকে গ্রেফতার করাতে। আকাশ রাহুলকে বলে, ভাই তুই যেমন ভাবে মেরেছিলিস, তাতে আমি শুধু অজ্ঞান হয়ে ছিলাম কিন্তু সমস্ত কথাই আমি শুনতে পাই। কিন্তু সেদিন একটা ছোট্ট ইয়ার্কির জন্য তুই এত বড়ো শাস্তি দিলি, তুই আদৌ মানুষ তো? এসেছিলাম গ্রামে একটা ভূতের গল্প লিখতে কিন্তু আজ জানলাম আর বুঝলাম যে ভূত বলে কিছু হয় না। ভূত হলো মানুষের মধ্যে থাকা একটা প্রতিশোধস্পৃহা মাত্র।

আলাপ

মহুয়া দাস
ষষ্ঠ সেমিস্টার

অনু কলেজের সামনে একটা মেসের খবর পেয়েছে। এই মেসে আজ তার প্রথম দিন। সারাদিনের ধকল আর তারপর মাইগ্রেনের ব্যথা, এখন একটু কিছু খেয়ে ঘুম দিতে পারলে বাঁচে। খাওয়া-দাওয়া করে শুতে যাবে, এমন সময় দরজা বন্ধ করতে গিয়ে অনুর চোখ পড়ে ব্যালকনিতে একটা বাচ্চা মেয়ের দিকে। আর বাচ্চাটাও ওর দিকে তাকিয়ে আছে। এই পরিস্থিতিতে অনু নিজে থেকেই কথা বলে,

- এই কে তুমি? এই সময় এখানে কী করছো?
- মেয়েটি বলে, আমি তো এই বাড়িতেই থাকি গো। এখন একটু ছাদে যাচ্ছি গাছে জল দিতে।
- অনু বলে, এত রাতে গাছে জল দিতে?
- মেয়েটি বলে, হ্যাঁ গো সারাদিন তো আমায় ছাদে উঠতেই দেয় না, ন্যাড়া ছাদ তো। তাই বাধ্য হয়ে রাতে লুকিয়ে লুকিয়ে আমি গাছে জল দিতে যাই।

এমন সময় অনু আর বাচ্চাটিকে দেখে বাড়ির নেড়ি কুকুরটা হঠাৎ এমন চেঁচিয়ে ওঠে যে সেই আওয়াজে অনুর মাথা ব্যথাটা আরো বেড়ে যায়। তাই এই গাছে জল দেওয়া ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগলেও পাত্তা না দিয়ে 'আচ্ছা' বলে দরজা বন্ধ করে শুতে চলে যায়।

এরপর দুদিন কেটে যায়। শনিবার কলেজ করে ও বাড়ি চলে যাবে। রবিবার অনুর জন্মদিন। জন্মদিনের উপহার হিসেবে ওরই ক্লাসমেট একটা চকলেট দেয়। কিন্তু ওর যে চকলেট খাওয়া বারণ সবাই তো আর জানে না সেই কথা। মেসে ফিরে ব্যাগ গোছাতে গিয়ে খেয়াল পরে বাচ্চা মেয়েটির কথা, ও মনে মনে ভাবে চকলেটটা মেয়েটিকেই দিয়ে যাবে।

ঘর থেকে বেরিয়ে অনু মেয়েটিকে কোথাও দেখতে পায়না। বদলে তার সাথে মালিকের দেখা হয়। বাধ্য হয়ে চকলেটটা মালিকের হাতে দিয়ে অনু বলে,

- কাকু, আপনাদের ওই বাচ্চা মেয়েটিকে এই চকলেটটা দেবেন।
- মালিক বলে, বাচ্চা মেয়ে! তুমি কার কথা বলছো?
- অনু বলে, সেদিন রাতে দেখা হল, ও বলে ছাদে যাচ্ছে গাছে জল দিতে।
- মালিক বলে, তুমি ওকে দেখেছো?
- অনু বলে, হ্যাঁ, কিন্তু কেন?
- মালিক বলে, ও আমার নাতনি ছিল। আমাদের ন্যাড়া ছাদে তাই ওকে উঠতে দিতে চাইতাম না।
- অনু বলে, হ্যাঁ, ও বলেছিল। কিন্তু...

- মালিক বলে, আগের বছরের ঘটনা, বাড়িতে অনুষ্ঠান ছিল, তাই জন্য ওর দিকে খেয়াল রাখতে পারিনি। খেলতে খেলতেই ছাদ থেকে পড়ে মারা যায় মণি। মণি অনেক শখ করে ছাদের গাছগুলো লাগিয়েছিল। ও মারা যাবার পর ছাদেই ওগুলো রেখে দিয়েছি। যা হোক তুমি এবার রওনা দাও। না-হলে বাড়ি পৌঁছাতে রাত হয়ে যাবে।

সেদিন মালিকের মুখে পুরো ঘটনা শুনে অনু স্তব্ধ হয়ে যায়। এখন সে নতুন মেসের খোঁজে রয়েছে।

অভিমান

মৈত্রী হালদার
ষষ্ঠ সেমিস্টার

ঠাম্মা ছোটবেলায় ভালোবেসে নাম দিয়েছিল বিজয়। তাই এখনো আদর করে জয় বলেই ডাকে। বাবা মায়ের নামটা পছন্দ না হওয়ায় বার্থ সার্টিফিকেটে নাম রাখলো অনির্বাণ। যখন ছোটো ছিলাম মা বলতো, মিথ্যে কথা না বলতে, ঝগড়া না করতে। অথচ প্রায় অনেক কারণেই ঠাম্মার সামনে মা মিথ্যে কথা বলতো আর আমাকেও অনেকটা জোর করিয়েই মিথ্যে কথা বলাতো। একবার বাবা কাজ থেকে ফেরার পথে একটা মিষ্টির দোকান থেকে ভালো ভালো মিষ্টি কিনে এনেছিল বাড়ির জন্য। পরের দিন সকালবেলায় জলখাবারের সাথে ঠাম্মা একটা মিষ্টি চাওয়ায় ঠাম্মার মুখের উপর বলে দেওয়া হয় ওই মিষ্টিগুলো দিদুনদের বাড়ি চলে গেছে, তাই ঠাম্মার আর মিষ্টি খাওয়া হবে না। অথচ একটু আগেই ফ্রিজ থেকে চকলেটটা বার করতে গিয়ে দেখেছিলাম মিষ্টিগুলো ফ্রিজেই রাখা আছে। এদিকে আমি কিছু বলতে যাবো এমন সময় মা আমাকে ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিয়েছিল। ছোটো ছিলাম বলে আমার কথার গুরুত্ব কেউ কখনো দেয়নি, এখনোও যে কেউ খুব একটা গুরুত্ব দেয় তাও নয়। কিন্তু সেই সময় ঠাম্মার মুখটাতে দেখেছিলাম একটা ম্লান হাসি। হয়তো সত্যিটা ঠাম্মার জানা ছিল, তাই ঠাম্মাও সেইদিন কিছু না বলে শুধু কিছুক্ষণ একটু করুণ চোখে তাকিয়েছিল। এখন আমি ক্লাস নাইনে পড়ি। বাড়িতে আর মন বসে না। নিজের পড়াগুলোও ঠিক মতো মনোযোগ দিয়ে পড়তে পারি না। সেইজন্য পরীক্ষাগুলোও খারাপ হয়েছে। স্কুলে এই নিয়ে তিনবার গার্জেন কল করা হয়ে গেছে। আর প্রত্যেকবার ফিরে এসে আমার ওপর চোটপাট করে গেছে। হবে নাই বা কেন? প্রতিদিনের এই ঝগড়া অশান্তিতে আমি অতিষ্ট হয়ে পড়েছি। নিত্যদিন ছোট ছোট কারণে ঝগড়া চলতেই থাকে আমাদের বাড়িতে। সে ঝগড়ার বিষয় যাই হোক না কেন ঘুরে ফিরে ঠাম্মার প্রসঙ্গ উঠে আসেই, ঠাম্মা কোথায় থাকবে সেই নিয়ে। আমি আর থাকতে না পেরে ওদের মাঝখানে বলেই উঠলাম, 'ঠাম্মা কোথায় থাকবে মানে, ঠাম্মা তো আমাদের সাথেই থাকবে'। কথাটা শুনে বাবা-মা তাদের সমস্ত রাগটা আমার উপর ঢেলে দিল। পড়াশোনা খারাপের জন্য আমাকে দায়ী করতে লাগলো। এমনকি আমার গায়ে হাত তুলতেও বাকি রাখলো না। এই প্রথমবার বাবা আমার গায়ে হাত তুললো। ঘর থেকে এক ছুটে আমি সোজা ঠাম্মার ঘরে গিয়ে ঠাম্মার কোলে মাথা গুজে শুয়ে পড়লাম। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলাম খুব।

কষ্ট হচ্ছিল তখন আমার। সেই সময় ঠাম্মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিল, 'বাবা মায়ের মুখের উপর কথা বলতে নেই দাদুভাই'। বলতে গেলে তো অনেক কিছুই বলতে ইচ্ছা করছিল আমার কিন্তু সেই মুহূর্তে ঠাম্মার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুই বলতে পারিনি আমি। সেই ঘটনার বেশ কিছুদিন পরে ঠাম্মার জামা কাপড় গোছানো হচ্ছে দেখে ঠাম্মাকে জিজ্ঞেস করলাম,

‘কোথায় যাচ্ছ তুমি ঠাম্মা’। ঠাম্মা কোন উত্তর দিচ্ছে না দেখে আমি মাকেই প্রশ্নটা করলাম। মা বলল, ‘এক আত্মীয়ের বাড়ি যাচ্ছে, কিছুদিন পরেই চলে আসবে’। আমি ভাবলাম বাড়ির একঘেয়ে জীবন থেকে কিছুদিন বেড়িয়ে আসলে ঠাম্মার শরীরটা ভালো থাকবে। অশান্তির জন্য ঠাম্মাকে আর আগের মতো দেখায় না। আগের থেকে অনেক বেশি চুপচাপ থাকে। ঠাম্মা ছাড়া এই বাড়িতে আমি এক মুহূর্ত থাকতে পারি না। আমার সবকিছুর আগে আমার ঠাম্মা। কোথায় কী করলাম, কখন যাব, কী করেছি সবকিছু এসে আগে আমি ঠাম্মাকে শোনাই। তাছাড়া এইসব শোনার মতো সময় কোথায় আমার মা-বাবার? তাই ঠাম্মা চলে যাবে শুনে মনটা একটু খারাপ হয়ে গেছিল কিন্তু ঠাম্মার শরীরের কথা চিন্তা করে আমিও আর আপত্তি জানাইনি।

প্রায় অনেকদিনই হয়ে গেল ঠাম্মা আসছে না দেখে বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘ঠাম্মা কবে আসবে?’ বাবা আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়েই নিজের কাজে বেরিয়ে গেল। এবার আমি মাকে ঐ একই প্রশ্ন করলাম, মায়েরও কোন সাড়াশব্দ না পাওয়ায়, এরকম আরও কয়েকবার জিজ্ঞাসা করাতে মা শেষমেশ রেগে বলে উঠল, ‘ঠাম্মা আর আসবে না, ওনাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসা হয়েছে। এখন থেকে উনি ওখানেই থাকবেন’। কথাটা শুনে কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে কোথায় হারিয়ে ফেলেছিলাম। সামলাতে পারছিলাম না নিজেকে। কাঁদতে কাঁদতে এক ছুটে চিলেকোঠার ঘরের একটা কোণায় বসে পড়লাম। তখন বারবার মনে হচ্ছিল কোথায় তুমি ঠাম্মা ফিরে এসো, বারবার মনে হচ্ছিল কেন যেতে দিয়েছিলাম সেদিন তোমায়। একবারও কেন বললাম না থেকে যাও, যেতে হবে না তোমায়। কেন বললাম না আমি? মা যখন আমাকে সামাল দিতে চিলেকোঠার ঘরে এলো সেই মুহূর্তে আমি রাগে, অভিমানে, ক্ষোভে ফেটে পড়ে মাকে একটাই কথা বলেছিলাম, ‘বাবার মতন আমিও তোমায় যদি ওই বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসি, তখন তুমি কি বুঝবে ঠাম্মার কষ্টটা?’

পরিণতি

দেবলীনা দাস
ষষ্ঠ সেমিস্টার

আমার বিয়ে হয়েছে পাঁচ বছর। বিয়ের একবছর দু'বছর পরেই শুরু হলো নাতি নাতনীর মুখ দেখবার আবদার। কিন্তু সন্তানগুলি থাকতো না আমার কাছে, মিস্ক্যারেজ হয়ে যেতো। অথচ ডাক্তারি সবগুলো রিপোর্টেই আমার মা হবার সম্ভাবনা বিদ্যমান। কত ডাক্তার, কত ওষুধ, কত আয়ুর্বেদ করেও সত্যি লাভ হলো না। একটা সময় খুব কষ্ট হত, কোনো শুভ অনুষ্ঠানে আমার প্রবেশ নিষেধ ছিল, কারণ আমি বাঁজা।

আমার শ্বশুরবাড়িতে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো হয়। একদিন দিলাম একটা মানত ঠুকে, 'আমার কোলেও যেন লক্ষ্মীর মতো একটা মেয়ে আসে মা'। এইবার মা বোধহয় আমার প্রার্থনাটা শুনলো। ঘুচে গেলো আমার বাঁজা নাম, আমার কোলে ফুটফুটে একটা মেয়ে এল। সাধ করে নাম রাখলাম কমলা। এই মেয়ের জন্য আমি নতুন জীবন পেলাম। যারা আমায় বিদ্রূপ করতো, তারাও কমলার খোঁজ নিত। ভালোই চলছিলো দিনগুলো। আস্তে আস্তে বড়ো হলো কমলা। সেই কমলা এখন আঠারো বছর বয়সের তরুণী। সে এবার উচ্চমাধ্যমিক দেবে। অনেক কষ্ট করে পেয়েছিলাম তো মেয়েটাকে, তাই বড়ো ভালোবাসি। এই তো এবারের জন্মদিনে ওর বাবা কতো লোকজন নিমন্ত্রণ করেছিলো, আমি পায়েস রান্না করেছিলাম, কি খুশি হয়েছিলো মেয়েটা। পিঠপিছে অনেকে অনেক কথাই বলেছিলো - মেয়ের আবার জন্মদিন, তার উপর আবার পায়েস রান্না করেছে , এমন বাপের জন্মেও শুনিনি যে মেয়ের জন্মদিনে পায়েস হয়। মেয়েকে বলেছিলাম এসব কথা গায়ে মেখো না। নিজের শর্তে, নিজের ছন্দে জীবন লেখো।

এতো সুখ বোধহয় সহ্য হলো না বিধাতার, ঘটে গেলো সেই অঘটন, কী অঘটন? দাঁড়ান বলছি - কমলা পড়তে গেছিলো কোচিং-এ। ছটা থেকে পড়া , ওই বাড়ি ফিরতে ফিরতে আটটা বাজে। সেদিন আটটা বাজলো, নটা বাজলো, দশটা বাজলো, মেয়ে আমার বাড়ি ফিরলো না। বারে বারে ফোন করছি, ফোন সুইচড অফ। আমার দাদা আর আমি পাগলের মত খোঁজাখুঁজি করছি। ওর বন্ধু বান্ধবদের ফোন করছি কিন্তু কেউ বলতে পারছে না। শেষে পুলিশের কাছে গেলাম, মিসিং ডায়েরি করতে। পুলিশের অনুমান হয়তো মেয়ে প্রেম করে প্রেমিকের সাথে পালিয়ে গেছে। কিন্তু আমি জানি আমার কমলা অমন মেয়ে নয়, যেখানেই যেত আমাকে বলে যেত।

মা হয়ে শুধু একটাই কথা বলবো, ধর্ষককে জ্বালান মোমবাতির আগুনে! না হলে কে বলতে পারে, একদিন হয়তো আপনার মেয়েও আসবে এভাবে খবরের হেডলাইনে।

হারাধনের সংসার

রিয়া কুণ্ডু
ষষ্ঠ সেমিস্টার

সকাল থেকেই বাড়ির মধ্যে বিরাট হৈ চৈ বেঁধে গেল। জমিদার বংশের একমাত্র পুত্র হারাধন বাঁড়ুজ্যের বিয়ে বলে কথা। পাশের গ্রামের এক জমিদার বংশেরই অপরূপা সুন্দরী কন্যা গিরিবালার সঙ্গে। সানাই বাজিয়ে মহা আড়ম্বরে হারাধনের সাথে গিরিবালার বিয়ে হল। খুবই সুখে সংসার করছিল গিরিবালা, কিন্তু অনেকগুলো বছর পেরিয়ে গেলেও গিরিবালা কোনো সন্তানের জন্ম দিতে পারেনি। হারাধনের এত সম্পত্তি কিন্তু তার উত্তরাধিকারী থাকবে না! এই নিয়ে হারাধন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লো। সমস্ত সুখ থাকা সত্ত্বেও সন্তান নেই, এ যেন মেনে নিতে পারলো না হারাধন, তাই সে দ্বিতীয়বার বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিল। হারাধনের দ্বিতীয় স্ত্রী হরসুন্দরী। হরসুন্দরী রূপবতী ছিল না কিন্তু ছিল প্রচণ্ড অহংকারী। হরসুন্দরীকে বিয়ে করার পর হারাধন গিরিবালাকে তার বাপের বাড়ি রেখে এল আজীবনের জন্য। গিরিবালার অপরাধ সে নিঃসন্তান।

এরপর এক এক করে হরসুন্দরী চার পুত্র ও দুই কন্যা সন্তানের জন্ম দিল। হারাধনের এখন ভরা সংসার। সন্তানদেরকে লেখাপড়া শিখিয়ে, সমস্ত রকম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিয়ে বড়ো করে তুলল হারাধন। কন্যাদের বিয়ে দিল, পুত্ররাও প্রতিষ্ঠিত হল। এরই মাঝে হারাধন হরসুন্ধরীকে লুকিয়ে গিরিবালার কাছে দেখা করতে যেত এবং কিছু টাকাও দিয়ে আসতো। এরপর হারাধন পুত্রদের বিয়ে দিল, পুত্রবধূরা সবাই আলদা আলাদা ভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়লো নিজেদের সংসার গোছাতে। বৃদ্ধ হারাধন ও তার স্ত্রী হরসুন্দরী এখন হয়ে উঠল পুত্রদের সংসারের বোঝা।

পুত্রদের চকচকে বাড়িতে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে যেন ঠিক মানাচ্ছে না। উঠতে-বসতে গালিগালাজ শুনতে হতো বৃদ্ধ হারাধন ও তার স্ত্রী হরসুন্দরীকে। দুবেলা দু'মুঠো খাবারের জন্য তাদের বসে থাকতে হতো পুত্রদের দরজার সামনে। ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে থাকে বৃদ্ধ হারাধন জীবনের নির্মম বাস্তবতার দিকে। তবুও সন্তানদের প্রতি তার কোন অভিযোগ নেই। এই সন্তানদের জন্য সে তার প্রথম স্ত্রী গিরিবালাকে ত্যাগ করেছিল। হঠাৎ একদিন খবর এলো গিরিবালার মৃত্যু হয়েছে। এই দুঃসংবাদ শুনে হারাধনের দু'চোখ দিয়ে জল নেমে এলো। গিরিবালাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল সন্তানসুখ না পাওয়ার জন্য। কিন্তু তবুও গিরিবালার প্রতি হারাধনের মনে কোথাও না কোথাও জায়গা ছিল। বৃদ্ধ হারাধন লাঠি হাতে খালি পায়ে শ্মশানে যায়। আজ বৃদ্ধ হারাধন নিজেকে আটকে রাখতে পারল না, হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো। কাঁপা কাঁপা হাতে গিরিবালাকে সিঁদুর দিয়ে রাঙিয়ে তাকে শেষ বিদায় জানালো। নিজের অজান্তেই সে যে কতখানি গিরিবালাকে ভালোবেসেছিল তা আজ উপলব্ধি করতে পারলো। গিরিবালার কিন্তু কোনদিন কোন

অভিযোগ ছিল না তার স্বামীর প্রতি। মৃত্যুর আগে অবধি স্বামীর মঙ্গল কামনার কথা ভেবে সে শাঁখা-সিঁদুর পরে এসেছে।

পুত্রবধূ নোটিশ দিয়েছেন, এবার থেকে যেন হরসুন্দরী আর হারাধন আলাদা রান্না করে খায়। এই খবর শুনে হরসুন্দরীর মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। সংসারের সমস্তই পুত্রবধূদের দিয়ে সে আজ নিঃস্ব। রান্না করে খাবার মতো শারীরিক বা মানসিক কোনো শক্তিই তার নেই এখন। তবুও কিছু ডালপালা কুড়িয়ে সে রান্নার জোগাড় করতে লাগলো কিন্তু পারলো না, হঠাৎ হার্ট ফেল করে হরসুন্দরীর মৃত্যু হল। বৃদ্ধ হারাধনের অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে উঠলো। সামান্য চায়ের জন্য হারাধন লোকের দরজায় দরজায় হাত পাততে লাগলো। চা-ই ছিল তার নেশা। হারাধন এখন ভাগের বাবা। পালা করে করে খেতে দিত ছেলেরা দু'বেলা-দুমুঠো। কোনদিন পেট ভরতো আবার কোনদিন ভরতো না। কন্যারাও কোনদিন মুখ ফিরিয়ে দেখেনি হারাধনকে। পুত্র এবং পুত্রবধূরা যেন অপেক্ষায় আছে কবে সংসারের আবর্জনা হারাধন বুড়ো মরবে। জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে হারাধন সংসারের নির্মম এবং করুণ বাস্তবতাকে উপলব্ধি করল। হারাধনের মনে পরলো নববধূ গিরিবালাকে, চোখ দিয়ে দুফোঁটা জল গড়িয়ে এল। হারাধন পৃথিবীর সমস্ত মায়া ত্যাগ করে শেষ নিশ্বাস ফেলল।

হ্যালোইনের রাত

সঙ্গীতা সর্দার

দ্বিতীয় সেমিস্টার

হ্যালোইনের জঙ্গল-পার্টিতে অংশগ্রহণ করতে এসেছে ওরা তিন বোন। এঞ্জেলা, নিনা ও মিশেল। নিনা আর মিশেল বয়সে বড়, এঞ্জেলা অনেক ছোট। ১৬ বছর বয়সে পড়ল এবার। বাইরের জগত সম্পর্কে একেবারেই অসচেতন। দুই বোনের সাথে এবার প্রথমবার যোগ দিচ্ছে হ্যালোইন-জঙ্গল পার্টিতে।

পার্টিতে যারা অংশগ্রহণ করবে সবাই এসে গেছে। কিছু বয়স্ক দম্পতি, কয়েকজন ছেলে-মেয়ে, বাচ্চাকাচ্চা । এঞ্জেলারা তিন বোন মিলে মোটের ওপর ৩৫-৪০ জন হবে। ঠিক রাত ১০:৩০ মিনিটে বাস ছাড়বে ওদের। তারা তিন আসনের সিট দখল করে বসে গেল। বাসের মধ্যে বাচ্চাদের হৈচৈ আর অন্যদের উল্লাস চিৎকারে কান ঝালাপালা হয়ে আসছে। অনেকেই ভ্যাম্পায়ার আর ওয়্যারউল্ফের মুখোশ পড়ে একে অন্যকে হাস্যকরভাবে ভয় দেখানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এঞ্জেলা বসেছে সিটের করিডোর সাইডে। লাল একটা হুডওয়ালা গাউন তার পরনে। চুপচাপ বসে আছে ও। ব্যাপারটা চোখ এড়ালো না নিনার।

নিনা - কি হয়েছে তোর?

এঞ্জেলা ইশারায় পেছনে বসা ভ্যাম্পায়ারের মুখোশ পরা একটা লোককে দেখালো, সেই লোকটি এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তাকানোর ভঙ্গিটা কেমন যেন রহস্যময়, কিছুটা ভয়ঙ্করও। নিনা এঞ্জেলা কে লোকটার দিকে তাকাতে বারণ করল। ছোটো বোনটা বেশ সুন্দরী, তাই লোক জন একটু লোলুপ দৃষ্টিতে তাদের বোনের দিকে তাকায় এটা ওরা ভালো করেই বোঝে। তাই এইসব ব্যাপারে তারা বেশি পাত্তা দেয় না। আজ হ্যালোইনের পার্টিতে ওরা তিনবোন খুব মজা করবে। রাত ১২:০৪ মিনিট নাগাদ বাস এল শহরের বাইরে অবস্থিত উল্ফ ফরেস্ট নামক জঙ্গলের সামনে। নেকড়ে আর ভাল্লুকের অভয়ারণ্য এই বন। তবে ওরা বেশি ভেতরের দিকে থাকে, জঙ্গলের এই দিকটাতে প্রায় আসে না বললেই চলে। হৈচৈ করতে করতে সবাই বাস থেকে নেমে পড়ল। আগে থেকেই চারজন লোক পাঠানো হয়েছিল যাতে তারা আগে থেকেই ক্যাম্পের ব্যবস্থা করে রাখে। বয়স্ক লোকেরা ফায়ারের ধার ঘেঁষে ওদের ক্যাম্প বসালো। বাচ্চারা এদিক সেদিক দৌড়াদৌড়ি করতে লাগলো, যুবক-যুবতীরা ঘুরতে লাগল এদিক সেদিক কিন্তু ভ্যাম্পায়ারের মুখোশ পরা রহস্যময় লোকটাকে কোথাও দেখা গেলো না। নিনা ওর দুই ছোট বোনকে নিয়ে জঙ্গলের ভেতর দিকে ঘুরতে শুরু করলো। বিশাল এক পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে আকাশে। এত সুন্দর দৃশ্য আগে কখনো দেখেনি এঞ্জেলা। পূর্ণিমার আলোয় জঙ্গল দেখতে দেখতে দুই বোনের পিছন পিছন যেতে লাগলো সে। বনের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে এতই ব্যস্ত হয়ে পরেছিল যে কখন বোনদের ছেড়ে পথ হারিয়ে ফেলেছে বুঝতে পারেনি এঞ্জেলা। যখন বুঝতে

পারলো তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। চারিদিকে তাকিয়ে চমকে উঠল এঞ্জেলা। আশেপাশে কেউ নেই, একদম নিশ্চুপ বনভূমি। দিদির কাছে শোনা গল্পগুলো মনে পড়ে গেল এঞ্জেলার। হ্যালোইনের এই রাতে জেগে ওঠে সব দানবেরা। ভ্যাম্পায়ার আর ওয়্যারউল্ফেরা মেতে ওঠে রক্ত খেলায়। শরীরটা একটু ছমছম করে উঠলো। পিছনে একটা শব্দ হতেই ঘুরে তাকালো এঞ্জেলা। প্রথমে কিছুই দেখতে পেল না, কিন্তু পরে ভালো করে খেয়াল করতেই দেখল মুখোশ পরা সেই লোকটা এক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে, মুখোশের ভেতর থেকে লোলুপ চোখ দুটো তার দিকে তাকিয়ে যেন নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে হাসছে। প্রচন্ড ভয় পেল এঞ্জেলা। বুকের ভিতর হৃদপিণ্ডটা প্রচন্ডভাবে লাফাচ্ছে। লোকটা ধীরে ধীরে ওর দিকে এগিয়ে আসছে, এঞ্জেলাও ভয়ে পিছোতে পিছোতে সামনের দিকে মুখ করে দৌড়াতে শুরু করল। মুখ থেকে মুখোশ খুলে ফেলে লোকটাও তার পিছু নিল ।

হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরে এসে দুই বোনের খেয়াল পড়লো তাদের ছোট বোন তাদের সাথে নেই। এরপর চারদিকে খুঁজতে লাগলো কিন্তু কোথাও পাওয়া গেলো না। তারা প্রচন্ড ভয় পেয়ে গেলো.....

- মিশেল - কোথায় যেতে পারে এঞ্জেলা? ভীত কণ্ঠে প্রশ্ন করল।
- নিনা বলল, জানিনা!

বনের মধ্যে পথ হারানো অস্বাভাবিক কিছু না, অনিশ্চিত কণ্ঠ নিনার ।

কবিতা

জীবন

মঞ্জুরী সাউ
চতুর্থ সেমিস্টার

জীবন আমার মুক্তি
গল্প আমার শক্তি।
জীবন হয় গল্প,
আমার কথা বলার ক্ষমতা স্বল্প।
এই নিয়ে আমি থাকি,
জীবন এখনো পুরো বাকি।
আমি করি গান,
এই গল্প আমার প্রাণ।
জীবন আমার গতিময়,
মন আমার আবেগময়।
জীবন আমার মুক্তি,
গল্প আমার শক্তি।

ফাস্টফুড

সুইটি নস্কর
ষষ্ঠ সেমিস্টার

ভারতের লোকেরা
খায় শুধু পকোড়া,
এগরোল ভেলপুরি
খেয়ে খেয়ে হয় ভুঁড়ি।
চাউমিন, সামোসা
দেখা দেয় সমস্যা
পেট করে গোল
ডাক্তারের কাছে গেলে
খেতে বলে ঘোল।
কাটলেট পাওভাজি
পাঁপড় ভাজতে রাজি
মোমো আর তেলেভাজা
খেয়ে হয় মুখ তাজা।
কফি হাউস আর মনজিনিস
খাবারের গুতোয় মন যে ফিট
তাই আমাদের ভারত
ফাস্টফুডের বড়ো আড়ৎ।

কালের প্রবাহ

সুপর্ণা দাস
ষষ্ঠ সেমিস্টার

আমার বাড়ির পাশে ওই বটবৃক্ষ আছে ;
আমি একদৃষ্টে চেয়ে থাকি তার পানে।
বয়স আশি হবে, আমারও বুঝি তাই!
তবুও সে আজও নবীন,হয়েছি শুধু আমিই প্রবীণ...
তার আকাশ ছোঁয়া মাথা, আমায় টেক্কা দিয়ে যায়!
আমি চুপটি করে শুয়ে সেইটি দেখে যাই।
প্রশ্ন জাগে মনে, জলও আসে কোণে
নিষ্পলকে আমি শুধু দেখে যাই,ভেবে যাই,,,

আমার বাড়ির পাশে ওই বটবৃক্ষ আছে,
সে করেছে নবীন ,এই প্রবীণ বৃদ্ধাকে!
ইচ্ছা জাগে, এই বটবৃক্ষের ডালটি ধরে উঠবো আবার নবীন হয়ে !
তখন ঘুচবে আঁধার,
জ্বালবো আলো ,বাঁধবো নীড় এই অন্তরালে!
বুঝবে তখন কেমন লাগে বৃক্ষ ছায়ার আড়াল হতে।
তখনই, হয়তো হঠাৎ করে ডাক আসবে কালঘড়ির !
সময় ফুরোবে;
কিন্তু ফুরোবে না, 'আমার বাড়ির পাশে ওই বটবৃক্ষে'র নিষ্পলক দৃষ্টি!

গদ্য

পাহাড়যাত্রা

শ্রেতা পাঞ্জা

ষষ্ঠ সেমিস্টার

হঠাৎই একদিন বন্ধুদের সাথে বিকেলের আড্ডায় যোগ দিলাম। তাদের কথার মাঝে শুনতে পেলাম তারা দার্জিলিং ভ্রমণের ছক কষছে। দার্জিলিং যা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই অবস্থিত, প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় এবং পাহাড়ের সৌন্দর্য মন ভরিয়ে তোলে।

আমারও শুনে ভালোই লাগলো, কারণ অফিসের কারণে ছুটি পাওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না। যাও বা থাকে তা বাড়ি বসেই কেটে যায়। তাদের তাগিদে নিজেও একটু ছুটির আমেজ নিলে মন্দ হয় না, মনে মনে ভাবলাম। তো যথাযথভাবে টিকিট বুকিং হলো এবং আমরাও গোছগাছ করা শুরু করলাম।

ট্রেনে করে প্রথমে শিলিগুড়ি, তারপর গাড়ি করে দার্জিলিং। সেখান থেকে পরদিন সকালে টাইগার হিল। তারপর রয়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘা। ট্রেনে উঠে আমাদের যাত্রা শুরু হয়। ট্রেনে বন্ধুদের সাথে হট্টগোল, গল্প, গান, সবেতে যেন আমাদের যাত্রা জমে গেলো। যথারীতি দার্জিলিং পৌঁছে হোটেলে একদিন রেস্ট নিয়ে আমরা গেলাম ভোরের আগেই টাইগার হিল দেখতে।

সেই দিনের প্রথম সূর্যের আলো দেখতে যে কী সুন্দর ছিলো, তার মধ্যে সোনালী আভা পাহাড়ের গায়ে যেন সোনার মতো চকচক করছিলো। পরদিন গাড়ি করে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার সুযোগ। আমরা কেউই হাতছাড়া করতে চাইনা। সবাই তৈরি হয়ে বেড়িয়ে পড়লাম বিকেলের রোদ পাহাড়ের গায়ে এমনভাবে বিরাজ করছিলো আর মেঘের চাদর ঘিরে ছিল পাহাড়কে।

ওইদিন হয়তো আমাদের বন্ধুদের ছুটি কাটাবার শেষদিন ছিলো তবে প্রকৃতির এত সৌন্দর্য, বোধ হয় পৃথিবীর সব সৌন্দর্য্যকে হার মানায়। সেইদিনের পাহাড়যাত্রা আমাদের খুবই স্মরণীয় হয়ে ছিলো। বন্ধুদের সাথে ছুটির দিন, সাথে প্রকৃতি আর পাহাড়ের দৃশ্য দুটো যেন দার্জিলিং-এর অপরূপ সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছিলো।

জীবন – সে কি কেবলি যাতনাময়

অন্বেষা নন্দী
ষষ্ঠ সেমিস্টার

'I fall upon the thorns of life! I bleed!' (P. B. Shelly)

জীবন যে কাঁটায় মোড়া তা বোধহয় যত বয়েস বাড়ে তত বেশি করে বোঝা যায়। কিন্তু এই কাঁটার মধ্যে পড়ে রক্তপাত হতে হতে যাদের 'অ্যানিমিয়া' দাঁড়িয়ে যায়, তাদের সবার হাল-হকিকত বোধ হয় সামনে আসে না! এদিকে, এখন নতুন করে উৎপাদিত হয় না বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর' বা জীবনানন্দের 'কারুবাসনা'-র মতো জীবনরসে সিক্ত মনের বিশুদ্ধ খাদ্যও।

'কেমন আছো?' – অনেকেরই উত্তর আসে 'চলছে', অথচ পরিচিত মানুষগুলিকে চেপে ধরলে দেখা যাবে সেই সওয়াল-জবাবের আগে একজন অন্তত 'জীবন চলছে না আর সোজা পথে' ইত্যাদির সুরে বেখেয়ালি হয়ে পড়েছিল। আসলে 'Life is short', 'You only live once'-এর মতো উদ্ধৃতি সোশ্যাল মিডিয়ায় আকছার ঘোরে বটে; কিন্তু জীবন শুধুই শ্লথ গতিতে বেঁচে থাকার কাঠিন্য, পালিয়ে-বেড়িয়ে কোন জন্মান্তরে গিয়ে থামব তার গন্তব্য নেই!

যারা শখ করে দুঃখ পোষে (পড়ুন 'ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যায়'), তারা পোষা বেড়ালের ডাকে বিদ্রূপ শুনতে পায় কিনা জানিনা। তবে ইনসোমনিয়া যাদের জীবনে এসে শীতলপাটি বিছিয়ে জিরোয়, তাদের মধ্যে কারো শিরদাঁড়া পারিবারিক সমস্যার চাপে ন্যুব্জ, কেউ বা ব্যর্থ প্রেমিকা, কেউ একটা চাকরির চেষ্টায় বেহাল আবার কেউ ক্রনিক অসুখের শিকার। আবার 'ভাগ্যবান' হলে কারো এক জীবনেই এই সমস্ত ফ্লেভার একসাথে মেলে। এই সব মানুষগুলো চলার পথে একদিকে যেমন শুঁয়োপোকার প্রজাপতিতে পরিবর্তন দেখে প্রেরণা পায়, তেমনি ডিম ফোটা মুরগির কাবাবে পরিণতি দেখে দমে যায়। তবু কেউ কেউ ডারউইনের 'Survival of the fittest' তত্ত্ব অনুসরণ করে টিঁকে থাকার লড়াই চালিয়ে যায়, আর কেউ নিজের ভাঙাচোরা গল্পের উপসংহার লিখতে গলায় রশির ফাঁস বেঁধে বলে, 'বিদায় পৃথিবী'।

এ তো গেল এক শ্রেণির কথা। সমাজে আরো কিছু মানুষ আছে যাদের জীবন রোদ-বৃষ্টিতে মাথার ওপর ছাদ খুঁজতে কেটে যায়; আবার কেউ কেউ লাঙল-হাল-কাস্তে ধরেই ৩৬৫ দিন কাটিয়ে দেন, যেখানে সংসারকেন্দ্রিক চরিত্রগুলি প্রায়শই খাবি খায়! এদের সাথে জীবনের সম্পর্কটা বাস্তুতন্ত্রের কোন ধরনের খাদ্য-খাদকের আওতায় পড়ে, তা প্রকাশ্যে আসে না।

তবে কি জীবন মানে শুধুই বিমর্ষতার গীতিকা? – 'সে কি কেবলি যাতনাময়?'- তা নয়। জীবন মানে পছন্দের ল্যাভেন্ডার স্প্রে খরিদ করে তার ঘ্রাণ শ্বাস ভরে নেওয়া, জীবন মানে বাড়ি ফেরার পর উৎফুল্ল সারমেয়র লেজটিকে দোদুল্যমান অবস্থায় দেখা, জীবন মানে গাছের ডালে বায়স দম্পতির মান অভিমানের দৃশ্যপট, জীবন মানে আধুনিক কবিতা সংকলন, ভিন ভাষার

গানের সুরে চোখ বুজে আসা কিংবা জীবন মানে হয়ত কারো কাছে ফুটন্ত ভাতও। হয়ত এসব তুলনামূলকভাবে অস্থায়ী প্যারামিটার, তবে ক্ষতি কি যদি এরা নতুন সূর্যোদয় না হওয়া অবধি সঙ্গ দিতে থাকে আর বিষাদের চোখে ধুলো উড়িয়ে কেটে যেতে থাকে একের পর এক দিন? নিন্দুকেরা হয়ত একে উচ্ছন্নের পালিয়ে বেড়ানো বলবেন!

অরণ্যের অধিকারের অমূল্য

আত্রেয়ী চৌধুরী
চতুর্থ সেমিস্টার

মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের মনযোগ বিরসা চরিত্রকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হলেও এবং বিরসা প্রায় অরণ্যের অধিকার- এর সমান্তরাল হয়ে উঠলেও, লেখকের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়নি অন্যান্য চরিত্রগুলি। তাদেরই অন্যতম অমূল্য আব্রাহাম। অমূল্য বাঙালি চরিত্র। সে অ-মুণ্ডা কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে আখ্যানের দীর্ঘ অংশ জুড়ে না থাকলেও, তার গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। উপন্যাসে তার জীবনের তিনটি পর্ব দেখানো হয়েছে। যথা:

প্রথম পর্ব = তার ছাত্রজীবনের চকিত ও স্বল্পস্থায়ী পরিচয়।

দ্বিতীয় পর্ব = তার কর্মজীবনের ছবিটি মুদ্রিত। এখানে সে প্রথমে জেলের মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং পরে ডেপুটি সুপার।

তৃতীয় পর্ব = চাকরি থেকে ইস্তফা দেওয়া মুণ্ডা সমাজের মধ্যে জীবন কাটানো অমূল্যর ছবি আছে।

তিন পর্বে তার ত্রিমাত্রিক জন্ম পর্যায়। একপর্যায় থেকে আরেক পর্যায়ে উত্তরণের মাধ্যমেই অমূল্য চরিত্রের সিদ্ধি।

প্রথম পর্যায়ে - আমরা দেখি অমূল্য ব্যক্তি বিরসার বন্ধু, সুহৃদ। এখানে আছে তার ছাত্রজীবনের কথা। চাইবাসার মিশনে থাকাকালীন প্রথম দিন থেকেই অমূল্য বিরসার বন্ধুত্ব হয়। উভয়ের মধ্যেই গড়ে ওঠে আত্মিক সম্পর্ক, রীতিনীতি না জানা সরল বিরসার সে প্রায় অভিভাবক হয়ে ওঠে। সে বিরসাকে শেখায় 'ছেলেটার নাম অমূল্য। ইদারার পাড়ে গিয়ে ও বিরসাকে স্নান করতে শেখালো সাবান মেখে। একটি দড়ি দিয়ে বলল প্যান্টের কোমর বেঁধে নাও, শার্টটা গুঁজে নাও এমনি করে। শোনো কাউকে তুই বলো না, তুমি বলবে।' এই পর্বে বিরসা অমূল্যের বন্ধুত্ব এতটাই প্রগাঢ় ছিল যে লড়াইয়ের দিনে অন্য মুণ্ডারা বিরসাকে অমূল্যর সঙ্গ ছাড়তে বললে, বিরসা পাল্টা তাদের ত্যাগ করতে চেয়েছিল। 'অন্য বাবুরা হয়তো দিকু হয়, আমি হব না।' - অমূল্যর এই কথা তথা প্রতিজ্ঞা তার চরিত্রের বীজ, যা প্রসারিত ও পরিণত হয় পরবর্তী দুটি পর্বে।

দ্বিতীয় পর্যায় - এই পর্বে অমূল্যর কর্মজীবন চিত্রিত। যেখানে সে এক ব্যক্তি মুণ্ডা বন্ধুত্বের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে সমস্ত মুণ্ডা সমাজের বন্ধু ও সুহৃদরূপে অঙ্কিত। যে প্রতিজ্ঞা সে প্রথম পর্বে করেছিল, তারই ভিত্তিতে সে মুণ্ডাদের বিদ্রোহের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েছে। তাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নীরবে কাজ করেছে। চাকরি এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়েও সে মুণ্ডা সমাজের উপকার করে গেছে।

অমূল্য এখন সমগ্র মুণ্ডা সমাজের বন্ধু। সে চাকরির শর্তের বিরুদ্ধাচরণ করে। জেকবকে গোপন সংবাদ পাচার করে, যা কলকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এমনকী বিরসার

দ্বিতীয়বার বন্দী হবার দিন - বিরসার সঙ্গে অন্য মুণ্ডা বন্দীদের সাক্ষাৎকারের সুযোগ করে দেয়, যাতে বিরসা তার অনুচরদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারে।

তৃতীয় পর্যায় - এই পর্যায়ে আর পাঁচজন মুণ্ডার মত অমুণ্ডা অমূল্যর আত্মজাগরণ ঘটেছে, বিদ্রোহী সত্তা প্রকাশ পেয়েছে, চাকরি পরিত্যাগ করেছে। বিরসার বন্ধুত্বের স্তর পেরিয়ে, মুণ্ডা সমাজের প্রতি সহানুভূতিশীলতার স্তর পেরিয়ে, উলগুলানের সমর্থক হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে সে প্রমাণ করেছিল যে, সে দিকু হয়নি। আর এই পর্বে সে জীবন পণ করে প্রমাণ করল - আসলে তার সমগ্র চেতনা মগ্ন মুণ্ডারই রাজে। সে বিরসার বন্ধু মাত্র নয়, কিংবা সমগ্র মুণ্ডা সমাজের বন্ধু মাত্র নয়, সে মুণ্ডা জাগরণের পরিপূরক। উপন্যাসটির উপসংহারে নোট বইয়ে অমূল্য লিখেছে – 'ওরা সবাই আমাকে বলে চলেছে, আমরা যেমন চিরকালের সংগ্রাম, বিরসার সংগ্রামও তাই। কিছুই ফুরোয় না পৃথিবীতে। পরাজয়ের সংগ্রাম শেষ হয় না, থেকে যায়। কেননা মানুষ থাকে, আমরা থাকি। উলগুলান এর শেষ নাই। বিরসার মরণ নাই'।

অমূল্য চরিত্রের বিশিষ্টতা এখানেই যে সে সাধারণ বাঙালি ছাত্র থেকে বাবু হওয়া, বাবু হয়েও দিকু না হওয়া, দিকু না হয়ে মুণ্ডা-বন্ধু হওয়া, মুণ্ডা-বন্ধু হয়ে মুণ্ডা জাগরণে অংশ নেওয়া। অমূল্য গড়ে উঠেছে তীব্র গতিতে। গড়ে ওঠার পথে তার মধ্যে জেগেছে সরকারি কর্মীর শর্ত ও আনুগত্যের সঙ্গে দেশীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতির দ্বন্দ্ব। একদিকে তার কাজ, চাকরি, অন্যদিকে মুণ্ডাদের রাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন-বিবেক। শেষ পর্যন্ত তার বিবেকের জয় হয়েছে। একেবারে শেষে বিরসার মৃত্যু যে কলেরায় নয়, অমূল্যর মাধ্যমে একটা বড় বিতর্কের উত্থাপন ঘটে। চরিত্রের প্রয়োজনকে বিশিষ্ট করে তুলেছেন স্রষ্টা।

বাঙালির শিক্ষা ও সংস্কৃতি

কুহেলী মাঝি
চতুর্থ সেমিস্টার

ঘড়িতে প্রায় দুপুর ২টো। শেষমেষ ট্রেন রাধানগর স্টেশনে পৌঁছালো। যদিও এয়ারপোর্টে নেমেছিলাম সকাল ৬.৩০ টায়। ওখান থেকে ট্যাক্সিতে শিয়ালদহ। ওখানে কিছু টিফিন করে স্টেশনে এসে দেখি ডায়মন্ড লোকালের ট্রেনটি এই কিছুক্ষণ আগেই বেরিয়ে গেছে। প্রায় দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে পরের ট্রেনের জন্য। যদিও দমদম থেকে ট্রেন পাওয়া যেত তবুও শিয়ালদহ এসেছিলাম। কেননা আমি তখন অনেক ছোটো, একটু আধটু হলেও বেশ মনে পড়ছে বাবার হাত ধরে পুজোর সময় নতুন জামাকাপড় কিনতে এসেছিলাম। স্টেশন চত্বরে কত গল্পের বই, ঠাকুরমার ঝুলি, ছড়ার বই, ভ্রমণ সংক্রান্ত ছোট বই কিনবার জন্য কত বায়না করেছি এবং বাবা কিনেও দিতেন। বর্তমানে চাকরিসূত্রে বাবা-মা জার্মানিতে থাকে। প্রাইমারি স্কুলের গন্ডি সবেমাত্র পার হয়েছিলাম, তখনই আমাকেও চলে যেতে হয় বাবার সঙ্গে জার্মানিতে। এখন ওখানকারই বাসিন্দা আমরা। ওখানে থেকেই পড়াশোনা করছি। আজ প্রায় দশ বছর পরে গ্রামের বাড়িতে ফিরছি। কেননা আমাদের পুরো পরিবার গ্রামে থাকে। পুরনো জমিদার বংশ আমাদের। দুর্গাপুজোয় ১০০ বছর পূর্তির জন্য ঠাকুরদা বাবাকে বিশেষ করে আসতে বলেছেন। পুজোর এখনো ১৬ দিন বাকি, মা ৭ দিন পরে আসবেন। বাবার সাথে আমি কিছুদিন আগেই চলে এলাম। যেহেতু পরীক্ষার পরেই আমার পড়াশোনার চাপ কম ছিলো। যাইহোক ট্রেনে আসতে আসতে লক্ষ্য করছিলাম সবুজ শস্যক্ষেত, সুন্দর নীল আকাশ, তার নিচে কোথাও কোথাও ঝাঁক ঝাঁক কাশফুলে সাদা হয়ে আছে মাঠ। মাঠের সবুজ ধানক্ষেতে কেউ কেউ খেলা করছে, আকাশে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ - যেন এক অপূর্ব মনোরম দৃশ্য। ট্রেনের মধ্যে বাউল গান গেয়ে কিছু লোক পয়সা চাইছে। পয়সা দিলাম, গানও শুনলাম কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় বুঝতে পারলাম না। যতই হোক আমার জন্ম বাংলার মাটিতে। প্রথম বাংলাতে কথা বলেছি। একেবারে রপ্ত না হলেও চালিয়ে নেওয়ার মতো বাংলা বলতে পারি। স্টেশনে রামুকাকা রিক্সা নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমাকে আর বাবাকে দেখে তিনি দৌড়ে এসে আমাদের হাত থেকে ব্যাগপত্র নিয়ে রিক্সায় উঠলেন। বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছো রামুকাকা? আর বাড়ির সবাই ভালো তো? বলে প্রণাম করতে গেলেন।

রামুকাকা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, দিদিভাই কেমন আছো? তুমি তো একেবারে মেমসাহেব হয়ে গেছো। আমাকে চিনতে পারছো? সেই ছোট্টবেলায় আমার কাঁধে চেপে কত মজাই না করেছ। আমি ফ্যালফ্যাল করে ওনার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমাকে দেখে উনি কত খুশি তবু লক্ষ্য করলাম ওনার চোখ দুটো অশ্রুসিক্ত। মনে হল আমি যদি ওনাকে জড়িয়ে ধরতাম তাহলে কি উনি আরো খুশি হতেন। কই বিদেশে তো এমন হয় না। নিশ্চয়ই

উনি আমাকে খুব ভালোবাসেন। সেই আবেগে ওনার চোখে জল। মনে একটু কষ্ট হল। বাবার মুখে শুনলাম উনি আমাদের বহুদিনের কর্মচারী হলেও একেবারে নিজের লোক। সবাইকে কোলে-পিঠে করে যত্ন দিয়ে বড় করেছেন। তাহলে উনি আমার গুরুজন। বাবা ওনাকে প্রণাম করলো আমি কেন করলাম না, যার জন্য উনি কষ্ট পেয়েছেন। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা কী তা তো জানলামই না। বিদেশে কী শিক্ষা পেলাম। নিজের বিবেককে প্রশ্ন করতে লাগলাম। হঠাৎ রিক্সাটি দাঁড়ালো। লক্ষ্য করলাম রাস্তায় গর্ত। তাই রামুকাকা নেমে রিক্সাটা টেনে সামনে নিয়ে গেলেন। দুধারে ক্ষেতে চাষিরা গান করতে করতে কাজ করছে, কোথাও আবার পুকুর ধারে মাছরাঙা ওত পেতে বসে আছে, পুকুরে যেন কী ফুল ফুটে আছে, মাঠে গরু চরে বেড়াচ্ছে – সমস্তটাই কী অপূর্ব দেখতে। বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম পুকুরে ওগুলো কি ফুল। জানলাম ওগুলো শাপলা পদ্ম। এই পদ্ম দিয়েই মা দুর্গার পুজো হয়। ছেলেরা মাছ ধরছে আপন মনে। চারিদিকে বিশুদ্ধ বাতাস। লক্ষ্য করলাম সবাই কিন্তু খুব খুশি, মানুষ পশু-পাখি সবাই। তাহলে আমার মন ভারাক্রান্ত কেন? পথে লক্ষ্য করলাম অনেকে বাবাকে দেখে জিজ্ঞাসা করছেন কেমন আছেন, বাবাও জিজ্ঞাসা করছেন অনেককে। একপ্রকার ভাব-বিনিময় ভালোবাসা আদান-প্রদান হচ্ছে। একটাও চেনা লোক বাদ যাচ্ছে না বাবার কাছে। কই বিদেশে তো এমন হয় না। বাংলায় যে মানুষের মধ্যে এত আবেগ, এত ভালোবাসা এখানে না এলে তো আমি জানতেই পারতাম না!

অ্যাটম বোম

সায়ন্তনী মল্লিক
দ্বিতীয় সেমিস্টার

Atom Bomb!!!!

- নামটা শুনলেই মনে হয় এইটা কি কোন দলের নাম, না কী বোমার! কিন্তু আজকের গল্পটা এই অদ্ভুত নামের দলেরই। আর নামের থেকেও অদ্ভুত বাকি গল্পটা। আজ থেকে প্রায় ৫-৬ বছর আগের কথা - তখন গ্রীষ্মকাল বলতে যেটা বুঝতাম আর এখন যে ছবিটা মাথায় আসে দুটোর মধ্যে ব্যবধান অনেক বেশি। কিন্তু সে ব্যবধান বিশ্লেষণ না করে, আজ সেই গ্রীষ্মকালের শুরু হওয়ার গল্পটাই মনে আসছে।

ক্লাস ফাইভে পড়ি তখন, হাওড়ার ছোট্ট একটা শহরতলির মেয়ে। প্রথমবার পাড়ি দিলাম সেকেন্ডারি নামী স্কুলে পড়তে।

প্রথম দিন নতুন করে শুরু করার আনন্দের চেয়ে, মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখা ভয়টা বেশি ছিল। স্কুলের ভেতরে ঢুকে যখন ফাইভ বি তে প্রথম পা রাখলাম বিশ্বাস করুন পেটের মধ্যে গুড় গুড় করে উঠছিল ভীষণ। যাকে আমরা বলি- 'butterflies in the stomach' আর আমার মনে হচ্ছিল প্রজাপতিটা কি আর জায়গা পেল না ওড়ার, শেষমেশ আমার পেটটাই পছন্দ হল!! কি করবো বলুন, তখন মানেটা ওটাই বুঝতাম।

ক্লাসে ঢুকে এক কোণে চুপ করে বসতাম। যারা আমাকে সেই সময় চিনতো তাদের মতে আমি কথা বলতে শুরু করলে আমাকে থামানো বড্ড কঠিন। কিন্তু সেই সময় সত্যি খুব বেশিই চুপচাপ থাকতাম, নয়তো টানা দুই বছর পর পর 'silent girl of the year' খেতাবটা পেলাম কি করে? মন দিয়ে ক্লাস করার বৃথা চেষ্টা করার পর টিফিনের ঘন্টা বাজলেই আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতাম। হঠাৎ একদিন....

- এই তোর নাম কিরে? একগাল হাসি নিয়ে একটা মেয়ে হুট করে আমার পাশে এসে বসে বললো ।

আ..... আ... আমার নাম? একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলে উঠি। হ্যাঁ রে তোর নাম! আমি বৈশাখী। এবার বলে ফেল তোর নামটা। এক কথায় খুব কম সময়ে আপন করে নেয় সে আমায়। আমার ভয় দ্বিধাদ্বন্দ্ব সব কিছু এক লহমায় হারিয়ে যায় তার অনবদ্য হাসির মায়ায়। তার সেই নিখাদ বন্ধুত্ব আজও মনে পড়ে। প্রথম দিন ঘরে ফিরে মাকে বলেছিলাম জানো মা, আজ আমার একটা নতুন বন্ধু হয়েছে তার নাম বৈশাখী।

ধীরে ধীরে দিন কাটে, মাস শেষ হয়। স্কুলে মাঝে মাঝে শনিবার দিন এক্সট্রা ক্লাস থাকতো। সেরকম এক শনিবার স্কুল যাওয়ার সময় মাঝপথে দেখা হয় একটা মেয়ের সাথে। যেমন স্মার্ট তেমনি মিশুকে, আর ঠিক তেমনি লড়াকু স্বভাবের। সবার সাথে কথা বলছে এমন করে যেন

সবার দিদি ও। হঠাৎ আমায় দেখে বলে উঠল এই তুই নিউ এডমিশন না? কী নাম তোর? সবার দিদি হলেও আমার বন্ধু হতে বেশি সময় নেয় না সে। সুজাতা গুছাইত। সে কথা শুরু করলে হাসিয়ে হাসিয়ে পেটে ব্যথা না করিয়ে ছাড়ে না।

সিমরান, নামের মতোই মেয়েটা মিষ্টি। কিন্তু প্রথম দিন কথা বলে মনে হয়েছিল এই মেয়েটা করোলার চেয়েও বেশী তিতো। ঝগড়াটা শুরু হয়েছিল বৈশাখীর পাশে কে বসবে সেই নিয়ে। সেই ঝগড়ার মীমাংসা হয়নি অনেকদিন কিন্তু আস্তে আস্তে একটা বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে ওর সাথে ,আর তার সূচনা ছিল লাইফ সায়েন্স বইয়ের পেজ নাম্বার ৬৮ পড়তে গিয়ে, কি ছিল সেখানে সেটা না হয় নাই বললাম!

ধীরে ধীরে নতুন স্কুলে আমিও পুরনো ছাত্রী হয়ে উঠি। কথাটা ক্লাস এইট-এর। একদিন লাইব্রেরীতে গিয়ে দেখি একটি মেয়ে হরলিক্স গ্লাসের মতো একটা কাঁচের চশমা পড়ে মনের আনন্দে হিস্ট্রি লিখে চলেছে। তার সাথে কথা বলার আগে পাঁচবার ভাবতে হবে কারণ, এই যে ওকে দেখে মনে হবে ও একেবারে না হাসার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ওর সাথে কথা বলতে গিয়ে দুবার ভয় পেয়ে চলে আসি, তিনবার একটু ভয়ে ভয়ে গিয়ে একটু হেসে কথা বলি। কিসের ব্যাপারে জানেন? পড়াশোনার ব্যাপারে। কারণ, ওর সাথে অন্য কোনো কারণে কথা বলা বা ফাজলামো মারা একেবারেই বারণ। সেই রামগরুটা মনের অজান্তে কখন যে আদরের গরু হয়ে ওঠে, নিজেই বুঝতে পারিনা।

খেলাটা আমি সেভাবে দেখিনি কোনদিন। কিন্তু, ২রা এপ্রিল ২০১৬ আমার পাড়ার সঙ্গে অন্য এক পাড়ার ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল ছিল সেদিন। আমিও সেদিন খেলা দেখেছিলাম, আমাদের পাড়াই সেদিন জিতেছিল।

এর কয়েকদিন পর আমি পুরস্কৃত হই এদের সবার বন্ধুত্বে। শুরু হল আমাদের নতুন করে পথ চলা, নতুন বন্ধুত্বের সূচনা। কখনো বোর্ডে হার্টবিট আঁকা, আবার কখনও বা পেন্সিল বক্স দিয়ে ক্যামেরাম্যান হয়ে ভিডিও করা। আরো কত কী পাগলামো ছিল আমাদের। আর সবকিছুর মধ্যে মুখের হাসিটা ছিল অমলিন। আমাদের পরিবারও ছিল ওই সিমরান আমার বাবা, বৈশাখী পিসি, গরু দাদা, গুছাইত লাভার। এসবের কোন মানে নেই কিন্তু সেটাই ছিল মজার। আর ধোনিকে নিয়ে সেই গানটা...

'Sakshi ka Nasha pyara, Nasha Dhoni ko pagal Kiya' আর তখন আমি আমার কল্পনার জগতে মনের আনন্দে বিচরণ করে উঠতাম, আর আমার সঙ্গী হত ওরা।

এই দলের নামটা কিভাবে হল জানেন?

হঠাৎ একদিন পৌলমী আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল, আচ্ছা তোদের তো এত বড়ো দল, নাম কী তোদের দলের? তখন হুট করে গুছাইত বলে ওঠে - 'Atom Bomb'।

কলেজ ম্যাগাজিন

সাগিয়া পারভীন
দ্বিতীয় সেমিস্টার

লিখতে বসে কী লিখবো ভেবে উঠতে পারছি না। মনে হচ্ছে আমি কিছু ভেবে লেখার আগেই সবাই সব কিছু লিখে ফেলেছে। কেন যে এমনটা হয় জানিনা। ভীড় করে ভাষারা মাথার মধ্যে গিজগিজ করে, লিখতে তো হবেই। আমার জীবনে প্রথম কলেজ ম্যাগাজিনে লেখা তাই। এই কলেজ বলতে মনে পরে গেল আর সেই কথাই তোমাদের কাছে শেয়ার করব।

জীবনে ছোট বড় পরীক্ষা দিয়ে কলেজে ভর্তি হতে হয়। একটা মাধ্যমিক আর একটা উচ্চমাধ্যমিক। কিন্তু মাধ্যমিক পাশ করার পর যখন আমরা ইলেভেনে ভর্তি হলাম আর ইলেভেনের বার্ষিক পরীক্ষা মাঝপথে থেমে গেল। শুনলাম, পরীক্ষাটা হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। কারণ বিশ্বব্যাপী মারণ ভাইরাস কোভিড-১৯ ছড়িয়ে পড়েছে। পরীক্ষা তো বন্ধ হল কিন্তু পড়া বন্ধ হল না। বাকি পরীক্ষাগুলো হতেও পারে এই ভয়ে বেশ কিছুদিন যাবার পর জানতে পারলাম পরীক্ষাটা আর হবে না। আমরা সবাই ক্লাস টুয়েলভে উঠে গেছি। বাড়ির অভিভাবকেরা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা বার বার মনে করিয়ে দিত এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যাবো, তাই ভালো করে পড়াশুনা করা দরকার। সেই মতন প্রস্তুতি চলছিল আমার পড়াশোনার। কিন্তু এর মধ্যে বলে রাখা ভালো, সেই মুহূর্তে পৃথিবীব্যাপী-দেশব্যাপী-রাজ্যব্যাপী মৃতের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। নিউজ থেকে জানতে পারছি হসপিটালে বেড নেই, একটা অক্সিজেন সিলিন্ডার জোগাড় করা দুষ্কর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর তারমধ্যে পাড়া-প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজন অনেকেই করোনা আক্রান্ত হয়েছেন এবং মারাও গেছেন। স্কুল-কলেজ, বাজার-হাট, অফিস-কাছারি সব বন্ধ। কারফিউ ঘোষণা হয়েছে রাজ্যব্যাপী। আমার জীবনে এমন অভিজ্ঞতা ভোলার নয়, আমার মতন কেউই ভুলতে পারবে না কোনো দিনও। এমন সময় বাঁচা না মরা, কার ভাগ্যে কী আছে তাও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এই অবস্থায় আতঙ্ককে বুকে রেখে পড়াশুনা চালিয়ে গেছি। কিন্তু এবার শুনছি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হবে, আবার শুনছি হবে না। এই পরীক্ষা অনিশ্চয়তার মধ্যেও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনুপ্রেরণায় জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পড়াশোনার হাল আমি কখনোই ছাড়িনি। অবশেষে পরীক্ষা হলো না কিন্তু রেজাল্ট বেরোলো, ভালো ভাবে পাশ করেছি। এরপর দক্ষিণ কলকাতার নামজাদা কলেজ সাউথ ক্যালকাটা গার্লস কলেজ-এ ভর্তি হয়েছি। তবু আফসোস থেকে গেল নিজে পরীক্ষাটা দিতে পারলাম না। আর শেষ স্কুল জীবনের অধ্যায়টা এভাবেই শেষ করতে হলো। তবুও আমরা বেঁচে আছি ।

এই মারণ ভাইরাস কোভিড-১৯ আজ অনেকটাই প্রশমিত। কলেজ খুলেছে তিন চার মাস পর। প্রথম দিন কলেজের গেটের সামনে ঢুকতে গিয়ে একটু থমকে দাঁড়ালাম। মনের ভয়টা জানান দিয়ে বলল আবার স্কুল-কলেজের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে না তো? তবু জোর করে ঢুকলাম

কলেজে। নতুন ক্লাস,নতুন বন্ধু আর নতুন অধ্যাপক-অধ্যাপিকা --আবার এক ভালোবাসার জগত। সবাইকে নিয়ে আনন্দে কাটুক আমার কলেজজীবন।

স্বপ্নপূরণ এবং স্বপ্নহরণ

সুস্মিতা বোস
ষষ্ঠ সেমিস্টার

ব্যস্ত এক শহর, কোলাহলে ভরা রাস্তাঘাট, স্বপ্ন যেখানে তৈরি হয় নিজের আঙ্গিকে।

সেরকমই এক স্বপ্নের শহর কলকাতা। আমাদের সকলের প্রিয়। কোনো এক রবিবারের বিকেলে পড়ন্ত রোদে, দক্ষিণের হাওয়ায় উন্মত্ত রাজধানী। আকাশে বাতাসে যেন উষ্ণ প্রেমের ছোঁয়া, যুগলের প্রেমালাপ, আরো কত কি? হার না মানা প্রেমের সাথে চলছে নতুনকে খোঁজার দুর্বার প্রচেষ্টা ও আনন্দের সুখটান।

চেষ্টা শুধু নেই সেই গরিব ছোট্ট শিশুটির, যে ছুটির দিনেও বন্ধুদের সাথে পার্কে না খেলতে গিয়ে, খেলছে দুর্ভিক্ষের বাজারে। আর এই খেলায় তার একমাত্র সঙ্গী, না কোনো ফুটবল বা কোনো ক্রিকেট ব্যাট নয়, এই খেলার সঙ্গী হলো তার মার্কেটিং স্কিল – 'ও দিদি দুটো ধূপকাঠির প্যাকেট কেনো না প্লিজ, সকাল থেকে কিছু খাইনি, প্লিজ কেনো'। বিলাসবহুল হোটেল থেকে বেরোনো শিক্ষিত পয়সাওয়ালা লোকগুলো কেউ তার এই ছোট্ট দাবি পূর্ণ করতে পারে না। কোনো এক ট্যাক্সিতে বসে থাকা এক প্রেমিক তার প্রিয়তমার কাছে নিজেকে তুলে ধরতে তার ছোট্ট দাবি পূর্ণ করেছিল।

দূরে একটি বিজ্ঞাপন দেখা যায় SBI Life Insurance-এর যেখানে পরিবারের নিরাপদ ভবিষ্যৎ-এর আশা সুনিশ্চিত করার অঙ্গীকার করা হয়েছে। শুধু নেই সেই ছোট্ট শিশুটির ভবিষ্যতের আশা সুনিশ্চিত করার কোনো বীমা কোম্পানি, কোনো জাতীয় মিশন।

আরো এক চাওয়ালাকে দেখা যায়। তার পরিবারকে নিয়ে চা খেতে যাওয়ার বদলে নিজেই চা বিক্রি করে কোনো না কোনো পরিবারের তৃষ্ণা নিবারণ করতে।

আমাদের স্বপ্ন নগরী কলকাতায় যেখানে একলহমায় স্বপ্নপূরণও হয় আবার স্বপ্নহরণও হতে দেখা যায়।

চিত্রকলা

সাগিয়া পারভীন, দ্বিতীয় সেমিস্টার

অন্নপূর্ণা হোড়, চতুর্থ সেমিস্টার

সুদীপ্তা দাস, ষষ্ঠ সেমিস্টার

শ্রেতা পাঞ্জা, ষষ্ঠ সেমিস্টার

ফটোগ্রাফি

সৌমিতা রায়, চতুর্থ সেমিস্টার

অনুভব

ই-সংস্করণ

বাংলা বিভাগ

সাউথ ক্যালকাটা গার্লস্ কলেজ

২০২২-২০২৩